হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত আধাঁরে –পন্ডিত ভাতখন্ডে প্রবর্তিত ও প্রচারিত অভিনব সংগীত পদ্ধতির নিরিখে এক সমীক্ষা

kashmira Chakraborty(Dutta)

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয়সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারভের সবর্কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশ্রষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে----

হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম বহুকাল আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। (সংগীত-চিন্তা)

অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে,উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয়সংগীত অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ভরতের নাট্যশাস্ত্র , বৃহদ্দেশী, সংগীত-রত্নাকর, সংগীত-সময়সার, সংগীত-চূড়ামণি ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘কোন কোন রাগ – রাগিনীতে কি কি সুর লাগে তা তো মান্ধাতার আমলেই স্থির হয়ে গেছে। (সংগীত-চিন্তা)

কিন্তু মধ্যযুগে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ইন্দো-ঐশ্লামিক সংস্কৃতির অভুদয়ের কারনে দেশীয় এই ঐতিহ্যবাহী সংগীতশাস্ত্র বা বিজ্ঞানের যেমন অবলুপ্তি ঘটে, তেমনি বৈদেশিক সংস্কৃতির মিশ্রণে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সংগীত বিধি। ফলে বারে বারে হিন্দুস্থানী বা উত্তরভারতীয় সংগীতের ঘন ঘন রূপ পরিবর্তিত হয়। ফলে ‘বহু মতেষু প্রসিদ্ধানি” হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিশেষ করে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে।

সংগীতের যে মৌলিক উপাদান স্বর, সুর, ভাষা ইত্যাদির সব কিছুর লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। নিদারুন অবহেলার কারনে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রগুলি ক্রমে লুপ্ত হতে শুরু করে। এর অন্যতম কারণ, ঐতিহ্যবাহী মন্দিরাশ্রিত প্রবন্ধ সংগীতের রূপগুলি ক্রমশ দুর্লভ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংগীতশাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যাকারগণ যাঁরা ছিলেন, বাদশাহ নবাবের ঔদাসিন্যে তাঁদের সম্প্রদায়েরও প্রায় অবলুপ্তি ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজের কয়েকজন সংগীতপিপাসু সংগীতকে একটি উচ্চাঙ্গ বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে অন্যতম। বিশেষত উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতকে নিজ নিজ ভাবনা ও কল্পানুসারে সৈদ্ধান্তিক রূপ দেওয়ার কাজে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ ব্যবসায়িক দরবারী হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত মৌখিক পরম্পরায় বিশ্বাসী। অতঃপর এই শ্রেণীর অল্পশিক্ষিত-গায়ক-বাদকদের কাছে সংগীতশাস্ত্র জ্ঞান প্রত্যাশা করা যায় না।

প্রাচীন আচার্যদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ, বরং বলা যায় প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের পরম্পরা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রমানও পন্ডিত ভাতখন্ডের চিন্তাভাবনায় নিঃসৃত হয়। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত যে তত্ব তাঁর স্বরচিত ‘ লক্ষ্যসংগীত’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নিজের অনুধাবন করা প্রচলিত ব্যবসায়িক দরবারী সংগীতের এক নতুন তত্ব তিনি সৃষ্টি করেন। সেইটিই লক্ষ্যসংগীত নামে হিন্দুস্থানী বা উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতকের গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের সংগীতসিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কতটা যুক্তিযুক্ত সেই আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তাঁর হিন্দুস্থানী সংগীতের সিদ্ধান্তগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রকে বহন করে চলেছে কি না তার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যায়।

হিন্দুস্থানী সংগীত আলোচনার প্রসঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে যে যে দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করা যায়, তার মধ্যে প্রথমেই ‘হিন্দুস্থান’ বলতে কোন ভূখন্ডকে বোঝানো হয়েছে বা কেন উত্তরভারতীয় সংগীতকে হিন্দুস্থানী সংগীত হিসাবে আখ্যায়িত কেন করা হয়, তার এক সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যায়। কিন্তু ‘ হিন্দুস্থানী সংগীত’ কেন বলা হয়েছে পন্ডিত ভাতখন্ডে কিন্তু তাঁর নতুন সংগীতপদ্ধতির উদ্ভাবন এইরূপ বিশ্লেষণ কোথাও করেননি । যাইহোক, ‘হিন্দুস্থান’ কিংবা ‘হিন্দু’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, তার উল্লেখ কোথাও নেই বললেই চলে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে, আমাদের ভাষাতত্ত্বের নিয়মে স=হ, আমরা যাকে ‘আসাম’ বলি, আবার আসামের লোকেরা ‘অহম’ বলে থাকে, আবার আমরা ‘ সিন্ধু’ বলি,তাকে পারস্য, আফগানিস্থানের প্রাচীন ব্যক্তিরা ‘ হিন্দু’ বলতেন ।প্রকৃতপক্ষে ‘হিন্দু’ নামে একটি জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে বলে এই স্থানকে ‘ হিন্দুস্থান’ বলা হয়। এই হিন্ধুস্থানী সংগীতকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

হিন্দুস্থানী সংগীত

|------------------------------|---------------------------------------|

উপজাতীয় **গ্রাম্য গান** **নাগরিক গান**

(Tribal song) **(Folk song or rural song)** **(urban song)**

|

|---------------|------------------|

প্রবন্ধ গান **দরবারী গান** **লঘু নাগরিক গান**

(composed song) **(court music or art music)** **(Entertaining music)**

উত্তরভারতীয় দরবারীই সংগীতই পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্থানী সংগীত' হিসাবে পরিচিত হয়।

দরবারী সংগীত

|

|---|

স্বদেশী **বিদেশী**

(প্রবন্ধ-ভাঙ্গা রাগসংগীত) **(মধ্যযুগীয় ইন্দো-পারসিক রাগ সংগীত)**

এরপরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পন্ডিত ভাতখন্ডের প্রচারিত ও প্রবর্তিত নব্য যে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি, সেই সংগীত পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে একজন গবেষকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে আমার মনে হয়েছে ।পরবর্তীক্ষেত্রে, সংগীতের উচ্চতর শিক্ষার্থীদের সঠিক পথের অনুসন্ধানের জন্য সংগীতশাস্ত্রের মতের সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার থেকে তারা যেন কোনোক্রমে বিচ্ছিন্ন না হয়।পূর্ববর্তী বিদগ্ধ সংগীতশাস্ত্রীদের মতের বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় পন্ডিত ভাতখন্ডের মতের সাথে।হিন্দুস্থানী সংগীতশাস্ত্রের কতটা সুবিধাজনক হল তার বিশ্লেষণও বিশেষভাবে প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা উঠে আসার পশ্চাতে সবচেয়ে বড় কারণ হল, পন্ডিত ভাতখন্ডে যে সময়ে সংগীতজগতে প্রবেশ করেছিলেন সেই সময়টায় যাঁরা সংগীতগুনী

ছিলেন তাঁরা সকলেই পেশাদার দরবারী সংগীতজ্ঞ । দরবারী সংগীত বলতে বোঝায় পেশাদারী দরবারী সংগীতজ্ঞ। পেশাদারী ব্যবসায়িক সংগীতজ্ঞ রাজ-দরবারে যাঁরা সংগীত পরিবেশন করে কৌশলের দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই তাঁদের সাধনার সার্থকতা ছিল। এই দরবারী সংগীতজ্ঞদের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে প্রথাগত সংগীতের যে শাস্ত্র তার থেকে এবং তার ঐতিহ্য থেকে প্রায়শই বিরত থাকতে হয়। প্রাচীন শাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা না জানার কারণে পন্ডিতজীর পক্ষে সেই বিষয়ে ধারণা করা খুব কঠিন ছিল।কারণ এই দরবারী সংগীত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্র থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল সেটা বোঝা তাঁর শিক্ষা না থাকার জন্য এই সমষ্যা হয়েছিল। যাইহোক, মধ্যযুগে ভারতীয় সংগীত দুপ্রকার ছিল। লক্ষণ-যুক্ত লক্ষণ- সংগীত এবং লক্ষ্যসংগীত।কিন্তু লক্ষ্যসংগীত বলতে নিজের চোখে দেখে অনুধাবন করা যে, সংগীত তাকেই লক্ষ্যসংগীত বলা হয়। পন্ডিতজী সেই কারণে লক্ষ্যসংগীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং সেইকারনে তাঁর যে নবসিদ্ধান্তমূলক তত্ব তার নাম রেখেছিলেন ‘শ্রীমলক্ষ্যসংগীতম্’। কারণ সংগীতবিদ্যা বলতে আমরা বুঝি সংগীতের শাস্ত্র, বিদ্যা, এবং বিজ্ঞান। অর্থাৎ সঙ্গীতের যেকোনো বিষয়ের সত্যজ্ঞানই ‘ সংগীতবিদ্যা’ বা মিউজিকোলজির অন্তর্ভুক্ত। অতএব সংগীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যার যদি প্রাসঙ্গিকতা চলে আসে, তাহলে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা সমীক্ষা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

কবিগুরু তাঁর ‘ সংগীত-চিন্তা’য় সংগীত ও ভাব অধ্যায়ে লিখেছেন যে-‘আমাদের সংগীতশাস্ত্র নাকি মৃত শাস্ত্র, যে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা নাকি আয়ত্ত করিতে পারি না, এইজন্য রাগ-রাগিনী বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যকরণ লইয়াই মহাকোলাহল করিয়া থাকি। (সংগীত-চিন্তা)

বর্তমানে যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা করা হয় তাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল মিউজিক, এটি কিন্তু দরবারী সংগীত। বহুবছর পূর্বে আরেক ধরনের নিবদ্ধ সংগীত ছিল যাকে ‘প্রবন্ধ গান’ (composed music) বলা হত। তার মধ্যে গীত প্রবন্ধ (vocal composition) দেশী বা আঞ্চলিক রাগের ব্যবহার থাকবে।কিন্তু প্রবন্ধ পদগান বলেই তার মধ্যে সবক্ষেত্রে প্রাধান্য পেত ভাবের। এবং ভাব থাকলেই তার মধ্যেই গীতাভিনয় ও রসের সঞ্চার হবে।গানে যদি অভিনয় না থাকে , তা হলে প্রাচীন ‘কাকু’ এবং শ্রুতিজাতির উল্লেখ প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র না তা হলে দীপ্তা, আয়তা,মৃদ্যু, মধ্যা এবং করুণা এই পাঁচপ্রকার শ্রুতিজাতির ও প্রাসন্গিতা আসবে কি করে? একই স্বরকে নানা উচ্চারনের মাধ্যমে নানাভাবের প্রকাশ হয়,আবার সুরবিহীন কথার ক্ষেত্রেও নানা উচ্চারণের ভঙ্গি ব্যবহার করা হয়। ভঙ্গি না থাকলে ভাব আসে না, আবার ভাব না

থাকলে রসের উদভাবনা হয় না । ভারতীয় সংগীতে একটা প্রধান উপজীব্য বিষয়।রস না থাকলে নাট্য, সংগীত কোনো কিছুরই প্রাণ প্রতিষ্টা হয় না। কিন্তু ভাতখন্ডেজীর সংগীত-তত্ত্বের মধ্যে কিন্তু রস উপেক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন-

'সংগীত বেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিনীতে কি কী ভাব আছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন।' (রাগ ও ভাব) তিনি আরো বলেছেন ----

'কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিনীতে বিশেষ একটা ভাবের উৎপত্তি হয় , তার কারন বাহির করুন।'

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করিতে পারি যে,ভারতীয় সংগীতের রস ও ভাবের প্রসঙ্গ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। তাদের নির্লিপ্ত করে রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

আবার পন্ডিত ভাতখন্ডে প্রবর্তিত 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি' আলোচনায় ফিরে আসি।প্রথমতঃ শ্রুতি যে দুপ্রকার এবং তার ব্যবহার ও যে পৃথক এটি ও ভাতখন্ডেজী সঠিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। দুপ্রকার শ্রুতি হল 'অন্তর-শ্রুতি ও 'স্বর- শ্রুতি বা শ্রুতি–জাতি ।তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে স্বরের পরে শ্রুতির স্থাপন করেছেন। যা উচিত ছিল স্বরের পূর্বে স্থাপন। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে পন্ডিত ভাতখন্ডের স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। যেমন পন্ডিতজী বলেছেন সংগীত-চূড়ামণি গ্রন্থ সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থের অনুবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু জগদেকমল্ল রচিত 'সংগীত-চূড়ামণি' গ্রন্থ শারঙ্গদেব রচিত 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের (আ: ১২৪০ খ্রি:) প্রায় একশো বছর আগে রচিত। কিন্তু সংগীত চূড়ামণি গ্রন্থ অনুবর্তী নয়, পূর্ববর্তী গ্রন্হ। তিনি স্বরগ্রামের বাদী এবং রাগের বাদীকে অভিন্ন মনে করেছিলেন। কারণ স্বরগ্রামের স্বরগুলি স্থির এবং অন্তর শ্রুতি দ্বারা পরিমাপ্য। তাই,স্থির বাদী-সমবাদী স্বর ও শ্রুতি দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। রাগের বাদী স্বর চলমান, কম্পিত, আন্দোলিত এবং অন্যান্য অলংকার দ্বারা প্রকটিত হয় বলে শ্রুতি দ্বারা মাপা যায় না, প্রয়োগ বা ব্যবহার দিয়ে বোঝাতে হয়।

ভারতীয় সংগীতে নাদবিদ্যা সম্পর্কে উত্কৃষ্ট ধারণা থাকতে গেলে মতঙ্গমুনির 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থখানি পড়া ও বোঝা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পন্ডিত ভাতখন্ডে তাঁর নানা রচনায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি গ্রন্থখানি নাকি চোখেও দেখেন নি । তাছাড়া হিন্দুস্থানী সংগীত

পদ্ধতিতে (২য় ভাগ,পৃ: ৩০৭) তিনি কবুল করেছেন যে, তিনি 'সংগীত- রত্নাকর' গ্রন্থের কিছুই বোঝেন নি।

বর্তমানে আমাদের সঙ্গীতের যা বিকৃত স্বর বলে পরিচিত, সেইগুলি দরবারী বিকৃতস্বর পারসিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে, একটা স্বর কতটা দুর্বল কতটা প্রবল সেগুলি শ্রুতি(অন্তর শ্রুতি) দিয়ে বিঝানি হত । শ্রুতিকে ইংরেজীতে 'মাইক্রোটোন' বলা হয়। যদিও ভারতীয় শ্রুতিকে সঠিকভাবে 'মাইক্রোটোন' বলা যায় না। যদিও ভারতীয় শ্রুতিকে কেউ কেউ মাইক্রোটোন বলেন।কারণ, শ্রুতি শ্রবনযোগ্য কিন্তু পাশ্চাত্যের মাইক্রোটোন খুবই সুক্ষ হওয়ার জন্য কর্নগোচর হয় না । ৫৩ মাইক্রোটোন – এক সপ্তক, কিন্তু আমাদের ২২ শ্রুতিতে এক সপ্তক। আমাদের শ্রুতিকে পাশ্চাত্যে অন্তরশ্রুতি বলা হয় । স্বর ও স্বরগুলি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।'শ্রুতিজাতি' সম্পর্কে পন্ডিতজী কোনো আলোকপাতই করেননি। আবার দেখা যায়, তিনি যে রাগ-রাগিনীতে স্বরের পরিচয় দিয়েছেন, সেগুলি স্থির 'ঠাট-স্বর' ভিত্তিক। ঠাট – স্বরকেই রাগের ভাবানুসারে নানাভঙ্গি ও অলংকারযুক্ত করতে হয় ।

কিন্তু প্রাচীনকালে, একটা স্বর কতটা দুর্বল কতটা প্রবল সেগুলি শ্রুতি (অন্তরশ্রুতি) দিয়ে বোঝানো হত। তার কারণ, শ্রুতি শ্রবনযোগ্য কিন্তু পাশ্চাত্যের মাইক্রোটোন খুবই সুক্ষ হওয়ার জন্য কর্নগোচর হয় না। সাধারণভাবে মনে হয়, পন্ডিত ভাতখন্ডেজী ছিলেন বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত ১০ ঠাট পদ্ধতির উদ্ভাবক। কিন্তু পন্ডিতজীর লেখা 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি গ্রন্থের ২য় ভাগে (৩৪৭ পৃ) দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হবে তিনি তাঁর রামপুর ঘরানা পরম্পরায় ১০ ঠাটের ব্যাপারটি লাভ করেছিলেন। তিনি জনৈক 'মুন্সী' নামক ব্যক্তিকে দিয়ে 'সরমায় ইসরৎ' গ্রন্থটির মারাঠা তর্জমা করেছিলেন।

আমরা জানি, পন্ডিত ভাতখন্ডে ' চতুরপন্ডিত' এই ছদ্মনামের আড়ালে 'মলক্ষ্যসংগীতম্' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি কার লেখা বলা শক্ত। ১৯১৬ খ্রি: রচিত A short historical survey of Indian music of upper Indian গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি নাকি সংস্কৃত ভাষায় একটি সংগীত গ্রন্থ ও মারাঠি ভাষায় তার এক দীর্ঘ টীকা রচনা করেছেন। অথচ 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি' তে (২য় ভাগ ৩০৭ পৃ:) লিখেছেন যে, সংগীত রত্নাকর (সংস্কৃতেয় লেখা) ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে পড়েছেন। যাইহোক, আরও মজার ব্যাপার হলো, 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি' গ্রন্থে (১ম ভাগ, পৃ: ৮৪) তিনি

এমন মন্তব্য করেছেন যাতে মনে হয়, তিনি নিজের গ্রন্থ ‘ মলক্ষ্যসংগীতম্’ নিজেই কোনদিনই পড়েননি। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির (১ম ভাগ ১৪৬পৃ:) একজায়গায় বলছেন ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’ লুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ লক্ষ্যসংগীতম্ এ তিনি নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এইভাবে কয়েকটি মাত্র উদাহরন দেওয়া হল, আরো এমন অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা যায়।

যদিও উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে পন্ডিত ভাতখন্ডের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়। আজ যে শাস্ত্রীয় সংগীত সর্বশ্রেনীর সমাজে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহুল পরিমানে অনুশীলিত হছে এবং পদ্ধতিগত ভাবে শিক্ষার ব্যাপারে পন্ডিত ভাতখন্ডের দান অনেকখানি। তথাপি পন্ডিত ভাতখন্ডের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত তত্বগুলি তথা পন্ডিত ভাতখন্ডের মতানুসারে ক্রিয়াত্মক সংগীত ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেগুলি সংশোধন ও পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী বলে একজন গবেষকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে মনে হয়েছে।

References:

ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়, *ভাতখন্ডে স্মৃতিগ্রন্থ*,১৯৩৩

Bhatkhande, V.N, *Hindustani Sangeet Paddati*, 1962

ভাতখন্ডে, ভি. এন, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা,* হাতরস (উত্তরপ্রদেশ)সংগীত কার্যালয়, ১৯৬২
এস.এন.রতনঝংকার , *ভাতখন্ডে,* অশোক মিত্র,১৯৬৭

Nayar Spbhana, *Bhatkhande’s contribution to music*, popular prokashan, Delhi